**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী**

**ও মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা উপলক্ষে বিশেষ ফিচার**

**ফিরে এলেন বিপুল হয়ে**

আফরোজা পারভীন

দৃশ্যত হারিয়ে গেছেন আমাদের জাতির পিতা। ফিরে এসেছেন বিপুল হয়ে। সতত করে নামগান। তাঁর কীর্তি ও কর্মের আলোয় উদ্ভাসিত বাঙালি। কবি শামসুর রাহমানের কথায়,

‘ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর রৌদ্র ঝরে

চিরকাল, গান হয়ে

নেমে আসে শ্রাবণের বৃষ্টিধারা; যাঁর নামের ওপর

কখনো ধুলো জমতে দেয় না হাওয়া,

ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর ঝরে

মুক্তিযোদ্ধাদের জয়ধ্বনি।’

পিতাকে নিয়ে লেখা এ কবিতা পুরোনো হয় না। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, পিতার নাম আর মুক্তিযুদ্ধের অমর স্মৃতি স্মরিত হবে ততদিন।

১৭ মার্চ ১৯২০ গোপালগঞ্জের নিভৃত গ্রাম টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন জাতির পিতা শেখ মুজিব। ডাক নাম খোকা। পিতা শেখ লুৎফর রহমান, মাতা সায়েরা খাতুন। স্থানীয় গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক স্কুল, গোপালগঞ্জ সীতানাথ একাডেমি, মাদারীপুর ইসলামিয়া হাইস্কুল, কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজে পড়াশুনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই আপোশহীন মনোভাব ছিল। মানুষের প্রতি ছিল অপরিসীম দরদ। দেশের জন্য ভালোবাসা আর জাতীয় নেতাদের সাহচর্যে তাঁর মধ্যে শৈশবেই নেতৃত্বের গুণাবলী বিকশিত হতে থাকে। মুজিব, মুজিব ভাই থেকে শুরু করে একসময় তিনি হয়ে ওঠেন জাতির পিতা। বঙ্গবন্ধু খেতাবে ভূষিত হন।

জীবনের অর্ধেক সময় জেলে কাটিয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে অর্জিত হয়েছে দেশের স্বাধীনতা। স্বাধীন দেশে জাতি গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। নিজের দিকে ফিরে তাকাননি ক্ষণেকের জন্য। সম্পদ বলতে ছিল জনগণ এবং তাদের ভালবাসা। কোনো বাঙালি তাঁকে হত্যা করতে পারে এমন আশঙ্কা বঙ্গবন্ধুর মনে বিন্দুমাত্র ছিল না। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা ও ঘনিষ্ঠজনের অনুরোধ উপেক্ষা করে রাষ্ট্রপতি হয়েও বঙ্গভবনের মতো সুরক্ষিত স্থানে না থেকে থেকেছেন ধানমন্ডিতে অরক্ষিত নিজবাড়িতে।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে সারা জাতি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, কাঁদতে পারেনি ভয়ে। বুকে পাষাণ ভার। তবু যেন চোখ থেকে পানি পড়া নিষেধ, আর্তি আহাজারি করা বারণ। যে সঙ্গীন কেড়ে নিয়েছিল জাতির পিতা আর তাঁর পুরো পরিবারকে, সে সঙ্গীনের ভয়ে কাঁদতে পারেনি বাঙালি জাতি। শুধু যাদের বুকে সঙ্গীন ধরা যায় না সেই স্বাধীন দেশের আকাশ বাতাসে ধূলিকণা কেঁদেছিল, বাঙালি ফেলেছিল নীরব দীর্ঘশ্বাস।

কী ভয়ঙ্কর, কী নিষ্ঠুর আর কী ভয়াল ছিল সেই দিন রাত। ওই রাতে স্ত্রী শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, ১০ বছরের শিশুপুত্র শেখ রাসেল, দুই পুত্রবধু সুলতানা কামাল ও রোজি জামাল, সহোদর, আত্মীয় পরিজন ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কর্মকর্তা কর্মচারীসহ নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন জাতির পিতা।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নারী, শিশু ও বৃদ্ধাসহ নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়েছিল একাত্তরের ২৫ মার্চের কালরাতে। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট মধ্যরাতে গণহত্যা চালালো পাকিস্তানি হানাদারদের এদেশীয় দোসর কিছু বিশ্বাসঘাতক, যারা ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী কিছু দল। নারকীয় এই সেনা অভ্যুত্থানের পরিকল্পনার প্রধান হোতা ছিলেন শেখ মুজিবের সহকর্মী খন্দকার মুশতাক আহমেদ, যিনি তার স্থলাভিষিক্ত হন। সাথে ছিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। প্রবাসে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা।

-২-

কী হয়েছিল সেদিন! মহান মুক্তিযুদ্ধের তীর্থস্থান ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর বাড়িতে। সারাদিনের অফুরন্ত কাজ শেষে কর্মক্লান্ত বঙ্গবন্ধু ঘুমিয়ে ছিলেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের জন্য দিনরাত কাজ করছেন তিনি। একদল তরুণ সেনা ট্যাঙ্ক নিয়ে ঘিরে ফেলল তাঁর বাড়িটি। তখন পবিত্র আজানের ধ্বনি মুখরিত করছে দিকবিদিক। সে আজান ধ্বনিকে বিদীর্ণ করে ছুটে এলো ঘাতকের মেশিনগানের ঝাঁক ঝাঁক গুলি। ফোয়ারার মতো ছড়িয়ে পড়ল সে গুলি। একে একে শহিদ হলেন দেশের স্বাধীনতার জন্য নিবেদিত প্রাণ এক পরিবারের সদস্যরা। বাড়ির সিঁড়িতে অযত্ন অবহেলায় পড়ে ছিল জাতির পিতার মৃতদেহ। এদিক ওদিক ছড়ানো-ছিটানো ছিল বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী ও পুত্র পরিজনের লাশ।

বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল ও মর্মান্তিক ঘটনা। মহাত্মা গান্ধী, মার্টিন লুথার কিং, আব্রাহাম লিঙকন, পেট্রিস লুমুম্বা, এডওয়ার্ড কেনেডি, ইন্দিরা গান্ধীও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিলেন। কিন্তু এদের কাউকে বঙ্গবন্ধুর মতো সপিরবারে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়নি। পাকিস্তানিরা যা করেনি, করতে সাহস পায়নি তাই করল বঙ্গবন্ধুর আশেপাশে থাকা এদেশের ঘাতকরা।

১৬ আগষ্ট টুঙ্গিপাড়ায় তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয়। মাত্র পনের মিনিটে সামরিক তত্ত্বাবধানে মাটির নিচে শুইয়ে দেওয়া হয় হিমালয়সম এই মানুষটিকে। বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয় পরিবারের অন্য সদস্যদের। তাঁকে শেষ গোসল করানো হয়েছিল লাইফবয় সাবান দিয়ে, দাফন করা হয়েছিল রেডক্রসের কাপড় দিয়ে। শেষবারের মতো পিতাকে একটিবার দেখতে আসতে দেওয়া হয়নি তাঁর আত্মীয়দের। এমনকি আশেপাশের মানুষজনকেও।

বহুবছর পনের আগস্ট ছিল রাষ্ট্রীয়ভাবে উপেক্ষিত। আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন সরকার ১৯৯৬ সালে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ১৫ আগস্টকে রাষ্ট্রীয়ভাবে শোক দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর শুরু হয় বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচারিক কার্যক্রম। দীর্ঘ কাঁকর বিছানো পথ ডিঙিয়ে ২০১০ সালের ২৭ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত ৬ জন খুনিকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। বিদেশে পালিয়ে থাকা অন্য খুনিদের দেশে ফিরিয়ে ফাঁসি কার্যকর না করা পর্যন্ত শাপমুক্ত হবে না বাঙলার মাটি।

২০২০ সালের ১৭ জানুয়ারি জনকের জন্মশতবর্ষ। এই উপলক্ষে ১৭ মার্চ ২০ সাল থেকে ২৬ মার্চ ২১ সালকে মুজিববর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২১ সাল বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর বছর। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ ও বাংলাদেশের জন্মের সুবর্ণজয়ন্তী পালনের ঘোষণা দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একসময় জাতীয় ও দলীয় বিশেষ দিবস ও কার্যাদি তা গুরুত্বের সাথে পালিত হবে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। রাজধানী থেকে শুরু করে গ্রাম পর্যন্ত সম্প্রসারিত থাকবে এই কর্মকাণ্ড। এই উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকি উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি গঠন করেছে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক উপকমিটি। তাছাড়া সরকারি আধাসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। নানান উন্নয়ন ও গঠনমুলক কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্মের সুবর্ণজয়ন্তি ও জনকের জন্মের একশ বছর পালিত হবে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত দেশের প্রতিটি মানুষকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে।

শেখ মুজিব এক মৃত্যুজয়ী বীর, যিনি বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের অন্তরে বুনেছিলেন বাঙালিত্বের চেতনা। আজীবন লড়াই করেছেন প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে। কবি সুফিয়া কামাল বলেছিলেন, ‘এই বাংলার আকাশ-বাতাস/ সাগর-গিরি ও নদী/ ডাকিছে তোমারে বঙ্গবন্ধু/ ফিরিয়া আসিতে যদি!

ঘাতকচক্র বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে ঠিকই, কিন্তু জনগণের মন থেকে তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শের মৃত্যু ঘটাতে পারেনি। তাদের অন্তরে গ্রোথিত রয়েছে তাঁর ত্যাগ ও তিতিক্ষার সংগ্রামী জীবনাদর্শ।

#

০৬.০১.২০২০ পিআইডি ফিচার